# জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে

# আমরা কী করবো?

# জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে
# আমরা কী করবো?

© নেট্জ বাংলাদেশ

**প্রকাশনা**: অক্টোবর ২০২৪

**প্রকাশক**
নেট্জ পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস

**German Office**:
NETZ Partnershaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V.
Marktlaubenstr. 9
35390 Gießen
Germany
Contacat: +49 641 26555600

**বাংলাদেশ অফিস**
বাসা: ২০ (৪র্থ তলা), রোড: ১১ (পুরাতন ৩২),
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন নম্বর : +৮৮০২৪১০২১৪৩৬-৭
ওয়েবসাইট: www.bangladesh.org
ই মেল: info@netz-bangladesh.de

**ভাবনা ও রচনা**: মোঃ মনিরুজ্জামান

**ছবি**: নেট্জ আর্কাইভ, ডিআরসিএসসি এবং ইন্টারনেট

**প্রাসঙ্গিক পাঠ-বিন্যাস**: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

**হরফ**: শিপ্রা দাস

**প্রচ্ছদ ও রূপ**: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, কলকাতা | অভিজিত দাস

## সূ চি প ত্র


| আলোচ্য সূচি | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ১ শুরুর কথা | ১ |
| ২ জলবায়ু পরিবর্তন | ২ |
| ৩ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ | ৩ |
| ৪ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্যাসসমূহ | ৯ |
| ৫ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব | ১১ |
| ৬ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিসমূহ | ২১ |
| ৭ জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় | ২৪ |
| ৮ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কিছু প্রত্যয় | ৩৩ |
| ৯ উপসংহার | ৩৭ |

# মুখবন্ধ

জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। এর ফলে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা। এসব আমাদের জানা। আমরা এও জানি, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে প্রকৃতির আচরণ যাচ্ছে বদলে। আমরা যদি বিগত কয়েকটি দশকের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে প্রকৃতির সেই বিরূপ আচরণগুলো প্রত্যক্ষ করব । আমরা দেখতে পাব, আমাদের এই অঞ্চলে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আপদ ও দুর্যোগের মাত্রা এবং তীব্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বের জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশের মধ্যে  প্রথম সারির। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীরা। কিন্তু দেখা যায়, জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিষয়ে যথাযথ তথ্য ও সচেতনতার অভাবে অনেক সময় আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হই।

নেট্জ পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস বিগত চার দশকব্যাপী বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে অব্যাহতভাবে কাজ করে চলেছে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী আত্মসহায়তামূলক প্রক্রিয়ায় নিজেদের সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারেন। সেই লক্ষ্যে নেট্জ সহযোগী সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে জলবায়ু বিপদাপন্ন অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ে সহায়তা করছে। এছাড়া স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংলাপ, অধিপরামর্শ এবং বৈশ্বিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য কাজ করছে।

উন্নয়নকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি, সচেতনতা, বিকাশ ও বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে: আমরা কী করবো? শিরোনামে এই রচনা। **জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন কর্মসূচির** আওতায় এই পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পুস্তিকাটি প্রণয়নে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সবার সচেতনতা, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই পুস্তিকাটি যদি সেই উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে যৎসামান্য ভূমিকা রাখতে পারে তাহলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

শুভেচ্ছাসহ,

হাবিবুর রহমান চৌধুরী
কান্ট্রি ডিরেক্টর
নেট্জ পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস

# ১ শুরুর কথা

আমরা প্রায়শই শুনে থাকি যে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি হলেই বলা হয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তা বেড়ে যাচ্ছে। গরম একটু বেশি পড়লেও শুনতে হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কথা। আর তাই প্রশ্ন এসে যায়, জলবায়ু পরিবর্তন আসলে কী? এটা কি খালি চোখে দেখা যায়, নাকি অনুভব করা যায়? জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আসলে কী ধরনের দুর্যোগ বা আপদ দেখা যায়? জলবায়ুর কেনই বা পরিবর্তন হচ্ছে? যদি জলবায়ু পরিবর্তন হতেই থাকে, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের আদৌ কি কিছু করণীয় আছে? জলবায়ু সংক্রান্ত এসব নানাবিধ প্রশ্ন আমাদের মাথায় প্রতিনিয়ত ঘোরে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রভাব মোকাবেলায় আমরা বিভিন্ন উদ্যোগের কথা শুনতে পাই। এই ছোট বইটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে আমরা জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা পেতে পারি এবং প্রয়োজনে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারি।

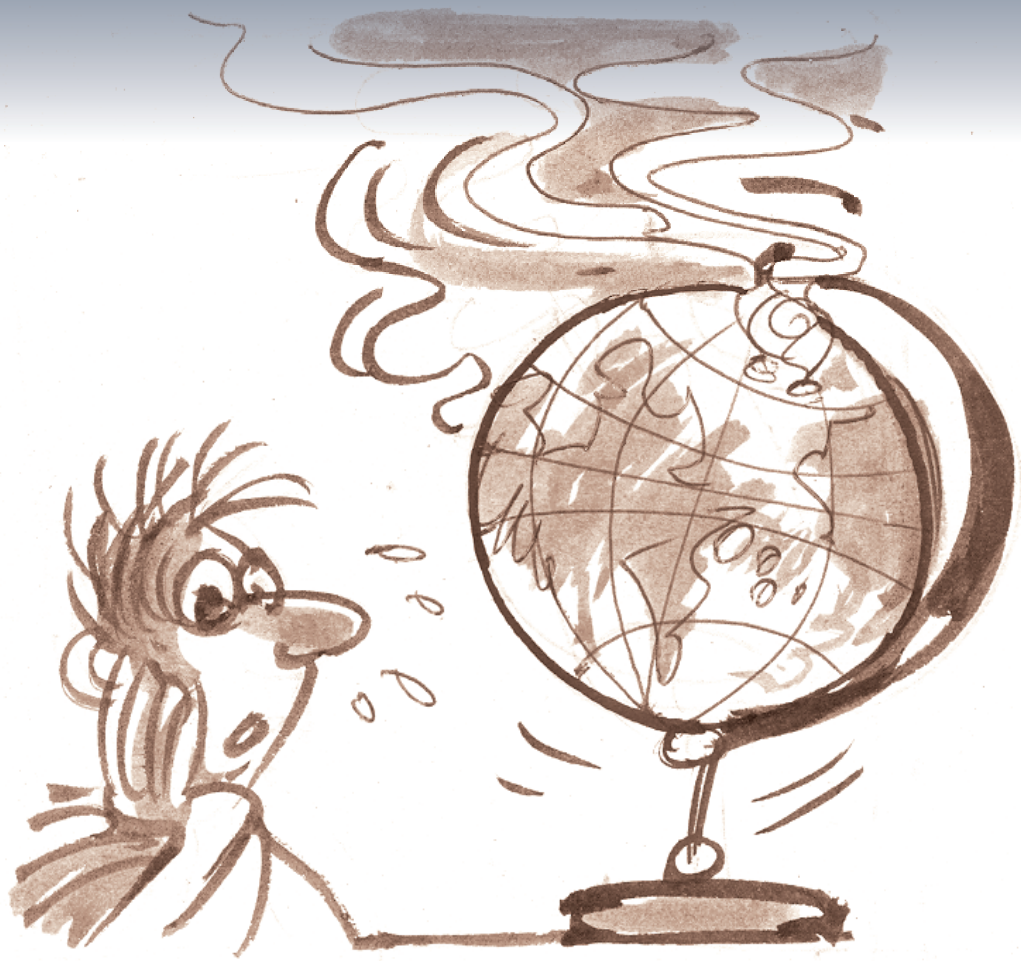

# ২ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে হলে প্রথমে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। আবহাওয়ার (Weather) সাথে জলবায়ুর (Climate) একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ নিবিড় সম্পর্ক বোঝার মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে পারে।

**২.১ আবহাওয়া (Weather):** আমরা প্রতিদিন সংবাদ-মাধ্যমে আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ পেয়ে থাকি। আবহাওয়ার সংবাদে একটা নির্দিষ্ট এলাকার বায়ুমণ্ডলের এক থেকে সাতদিনের তাপমাত্রা, বায়ুর গতিবেগ, বাতাসের আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বা সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে শুনে থাকি। এগুলোকে আবহাওয়ার উপাদান বলা হয়।

**‘আবহাওয়া হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের, একটি নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা। স্বল্প সময়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বাতাসের আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি উপাদানের অবস্থাকে আবহাওয়া বলা হয়।’**

## ২.২ জলবায়ু (Climate):

**‘জলবায়ু বলতে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা পুরো পৃথিবীর আবহাওয়ার উপাদান সমূহের দীর্ঘ সময়ের বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে বোঝায়। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুমণ্ডলের চাপ, বাতাস, বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য ভূ-তাত্ত্বিক উপাদান সমূহের দীর্ঘ সময়ের অবস্থার গড়কে জলবায়ু বলে।’**

এখানে দীর্ঘ সময় বলতে কমপক্ষে ৩০ বছর বা তার অধিক সময়কে বলা হয়েছে। জলবায়ু কোনো স্থির বিষয় নয়। এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। বিশ্বের সব জায়গায় জলবায়ুর অবস্থান এক রকম নয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সাধারণত ঠান্ডা আবহাওয়া থাকে। নিরক্ষরেখায় উষ্ণ আবহাওয়া থাকে, কর্কটক্রান্তিরেখা ও মকরক্রান্তিরেখা এলাকায় নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। তবে মৌসুম ভেদে এ আবহাওয়ার তারতম্য দেখা যায়। দীর্ঘ সময়ের এই আবহাওয়ার উপাদানের গড়কে জলবায়ু বলা হয়।

## ২.৩ জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change):

**‘বায়ুমণ্ডলের চাপ, তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য ভূ-তাত্ত্বিক উপাদান সমূহের দীর্ঘ সময়ের গড় পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।’** দীর্ঘ সময় বলতে কমপক্ষে তিরিশ বছর থেকে হাজার বা লক্ষাধিক বছরের জলবায়ুর উপাদানের গড় পরিবর্তনকে বোঝায়।

Source: Internet

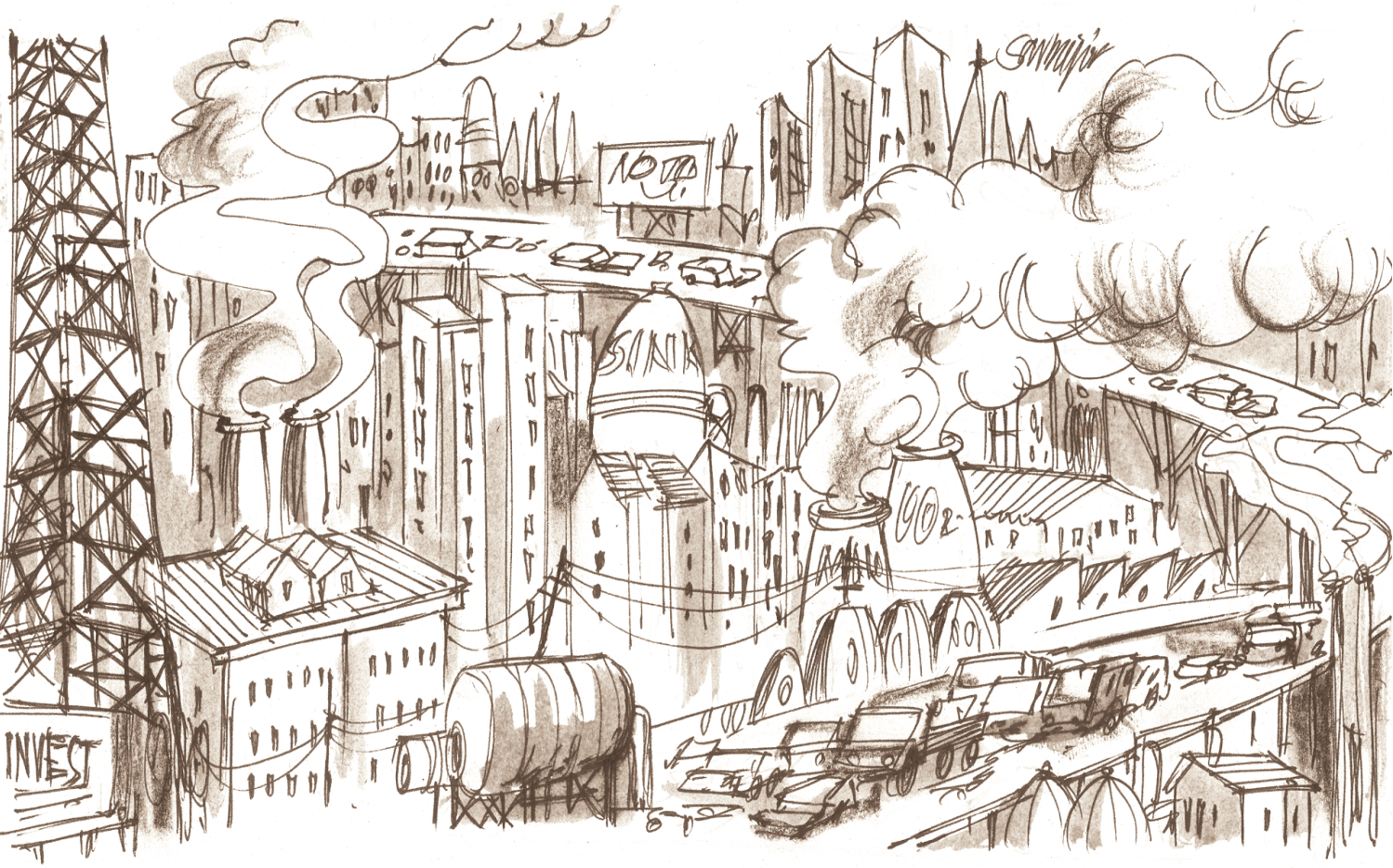


# ৩ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

আমরা জলবায়ুর যে দ্রুত পরিবর্তন ও অস্বাভাবিক অবস্থা দেখি তা সাধারণত মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ঘটে থাকে। মানুষের কার্যক্রমসমূহ বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলের গঠনকে পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তন একটা তুলনামূলক সময়ের মধ্যে জলবায়ুর প্রাকৃতিক পরিবর্তন হিসেবে প্রতিফলিত হয়। যেমন কোনো এলাকায় আগে একটা নির্দিষ্ট মৌসুমে পুরো মৌসুম জুড়ে বৃষ্টি হত, কিন্তু এখন সময়কাল কমে গিয়ে অল্প সময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। আস্তে আস্তে মৌসুমের পরিবর্তন হয়ে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে, একটা নির্দিষ্ট মৌসুমে অবহাওয়ার যে আচরণ করার কথা, এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এসব প্রভাবকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল হিসেবে দেখা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের নানাবিধ কারণ রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা জানি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অসহনীয় মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। শীত মরশুমের দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে এবং এখন আর শীতকালে আগের মতো ততটা শীত অনুভূত হয় না। বর্ষাকালে অনিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অল্প সময়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীতে তাপমাত্রার যে স্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়ার কথা, তার থেকে অনেক দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

সাধারণত দিনের বেলা সূর্য আলো ও তাপ দিয়ে পৃথিবীকে উষ্ণ করে তোলে এবং রাতের বেলা এই তাপের অধিকাংশ আবার মহাকাশে ফিরে যায়। তবে সব তাপ ফিরে যেতে পারে না। কিছু তাপ ভূ-পৃষ্ঠ ধরে রাখে। কিছু তাপ বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসগুলো রয়েছে, তারা শোষণ, সংরক্ষণ ও বিকিরণ করার মাধ্যমে ধরে রাখে এবং চলে যেতে বাধা দেয়। এই নিয়ম হাজার-লক্ষ বছর ধরে চলে আসছে। একারণে পৃথিবী অতি ঠান্ডা বা অত্যধিক গরম হয় না। এ-তাপ আবার সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে না বলে, স্থান-কাল ভেদে পৃথিবীর তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং এর ফলে পৃথিবীতে খুব সুন্দরভাবে বাস্তুতন্ত্র ও প্রাণী-বৈচিত্র টিকে থাকে।

**‘পৃথিবী থেকে অত্যধিক হারে বিভিন্ন গ্যাস নিঃসরণের কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সূর্যের তাপ একবার বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে, এটি গ্যাসীয় কণার সাথে সংরক্ষিত হয়ে আর সহজে ফিরে যেতে পারছে না। এর ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়।**

## ৩.১ জলবায়ু পরিবর্তনে গ্রিন হাউস গ্যাস কীভাবে কাজ করে?

গ্রিন হাউস বলতে আমরা এমন একটা ঘরকে বুঝি, যা সাধারণত পলিথিন বা কাচ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। অনেক এলাকায় শাক-সবজি চাষাবাদে এবং বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য এমন ঘর তৈরি করা হয়। যাতে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার মাধ্যমে ঘর উষ্ণ থাকে। এই কাচ বা পলিথিনের ঘরে সূর্যের আলো ও তাপ প্রবেশ করতে পারলেও, সূর্যের তাপ পলিথিন বা কাচের ঘরের বাইরে ফেরত যাওয়ার আগে, বার বার প্রতিফলিত হয় এবং দ্রুত চলে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। দ্রুত তাপ চলে যেতে না পারার কারণে, দীর্ঘ সময় উক্ত স্থান তুলনামূলকভাবে উষ্ণ থাকে।

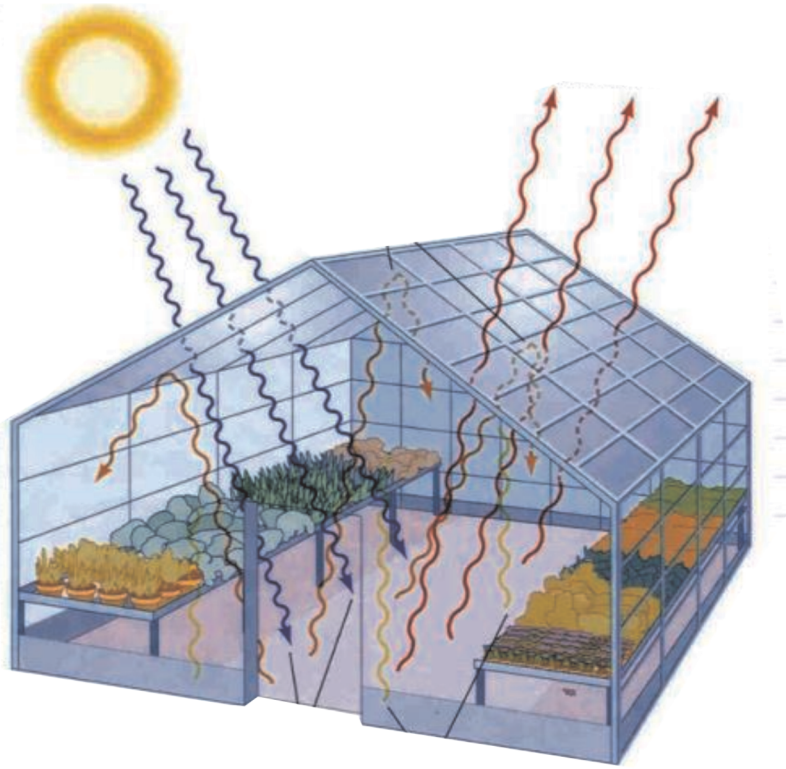

Source: https://www.quora.com/What-does-the-greenhouse-effect-have-to-do-with-greenhouses

আমরা যদি 'কাঁচের ঘরকে' পৃথিবীর সাপেক্ষে চিন্তা করি, তাহলে দেখা যায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এমন কিছু গ্যাস রয়েছে যা সূর্য থেকে আগত তাপের বিকিরিত শক্তিকে শোষণ করে এবং নির্গত করে। 'যেসব গ্যাস তাপকে শোষণ ও ধারণ করার মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে তোলে, তাকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলে। এই গ্রিন হাউস গ্যাসের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে যে এটি কতটুকু শোষণ ও নির্গত করবে। সহজভাবে বললে গ্রিন হাউস গ্যাস ঘনত্ব যত বৃদ্ধি পাবে, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তা ততো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এসব গ্যাসকে তাপ বৃদ্ধিকারী গ্যাস হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

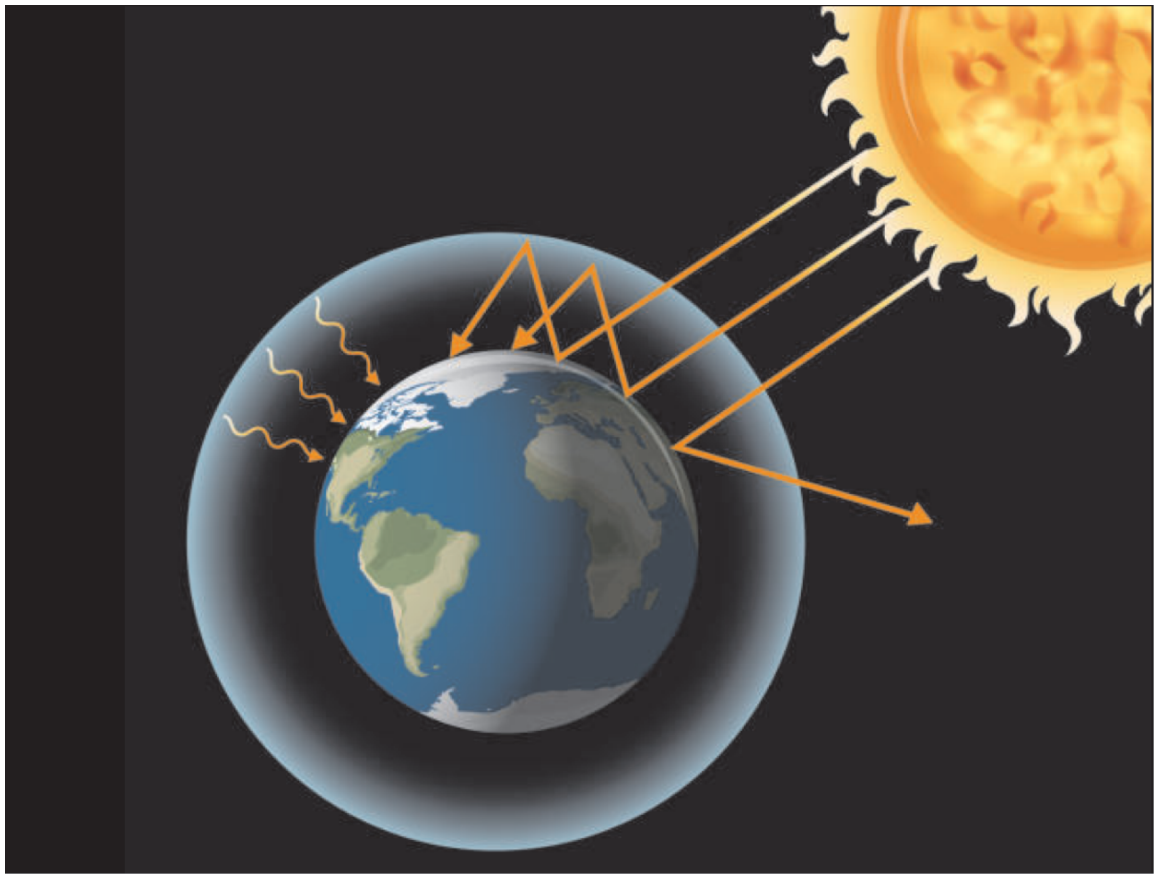

বায়ুমণ্ডলের সব গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস নয়। যেমন অক্সিজেন ($O_2$), নাইট্রোজেন ($N_2$). আর্গন (Ar) ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাস নয়। এসব গ্যাস অবলোহিত রশ্মি তথা তাপ শোষণ করে না। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে ও তাপ নির্গত করে বলে, এগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো নিয়ে পরবর্তীতে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। ১. প্রাকৃতিক কারণ ২. মানুষের সৃষ্ট কারণ।

**৩.২ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ** : জলবায়ু পরিবর্তনে বেশ কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাব রয়েছে। **'পৃথিবীর গতিশীলতা, অক্ষরেখার দিক পরিবর্তন, সূর্য থেকে পৃথিবীর অবস্থান, পৃথিবীর অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, পৃথিবীর প্লেটের গতিশীলতা, এল নিনো-লা নিনোর প্রভাব ও ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয় তাকে জলবায়ুর প্রাকৃতিক পরিবর্তন বলে।'** পৃথিবীর অভ্যন্তরের গতিশীলতা বা বর্হিজগতের প্রভাবে প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে

থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। প্রাকৃতিক কারণে যে জলবায়ু পরিবর্তন হয়, তার প্রভাব তেমন একটা নেই বললেই চলে। এ পরিবর্তন খুবই ধীর গতিতে হয়। পৃথিবী এই পরিবর্তন নিজেই অভিযোজিত করে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলে।

**৩.৩ জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের সৃষ্ট কারণ**: মানুষের সৃষ্ট কারণের মধ্যে ব্যাপক আকারে জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানোকে দায়ী করা হয়। শিল্প, কলকারখানা থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে গ্রিন হাউস গ্যাস-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ১৭৫০ সালের পর থেকে মানুষ অনেক শিল্প - কলকারখানা গড়ে তুলেছে। এই সময়টাকে শিল্প বিপ্লবের সময় বলা হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমের পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনের ধারা তৈরি হয়। অধিক উৎপাদনের জন্য প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন হয়। এসব জ্বালানির প্রধান জোগান আসে খনিজ তেল ও কয়লা থেকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের এসব তেল ও কয়লাকে জীবাশ্ম-জ্বালানি বলা হয়।

একটা সময় উৎপাদন ছিল পরিবার ও সমাজকেন্দ্রিক। শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এটি চলে যায় জ্বালানি নির্ভর কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানের অধিকারে। মানুষের জীবনযাপনের মধ্যেও প্রচুর পরিবর্তন আসে। শিল্প, বাণিজ্য, যাতায়াত, বসবাস সর্বক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এসব যন্ত্রের ব্যবহারে প্রচুর জ্বালানি রূপান্তরিত হয়ে গ্যাসে পরিণত হয়। শিল্প বিপ্লবের আগের তুলনায় শিল্প বিপ্লবের পরে ৪০ শতাংশ বেশি গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে। দিন দিন এসব তাপ সংরক্ষণকারী গ্যাসের নিঃসরণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে এবং বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের আগে হাজার বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব ছিল (২৮০+-) পার্টস পার মিলিয়ন (পিপিএম) যা বর্তমান সময় তথা ২০১৮ সালের পরে এসে ৪২০ পিপিএম ছাড়িয়ে গেছে।

যতই দিন যাচ্ছে মানুষ ততই নিজেকে আধুনিক হিসেবে দাবি করছে। নিজেদের উন্নতির দোহাই দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে জোরালো ভূমিকা রাখছে। একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, আমরা ঘর তৈরির জন্য যে ইট ব্যবহার করি তা কাঠ-কয়লা পুড়িয়ে বানানো হয়। জমি চাষে বিভিন্ন যান্ত্রিক পরিবহন ব্যবহার করি। ফসল উৎপাদনে শিল্প কলকারখানা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার করি। যাতায়াত বা মালামাল পরিবহনের জন্য যান্ত্রিক পরিবহন ব্যবহার করি। শিল্প কলকারখানা পরিচালনার জন্য প্রচুর বিদ্যুৎ ব্যবহার করি। এমনকী আমাদের প্রাত্যহিক কাজে আমরা কোনো না কোনো ভাবে বিভিন্ন জ্বালানি ব্যবহার করি। আর এই জ্বালানি থেকে উৎপন্ন গ্যাসসমূহ বায়ুমণ্ডলে গিয়ে জমা হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। যেসব দেশ নিজেদের উন্নত হিসেবে দাবি করছে এবং শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে, আসলে তারা সব থেকে বেশি গ্যাস নিঃসরণ করেছে। এসব দেশ প্রধানত ঐতিহাসিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

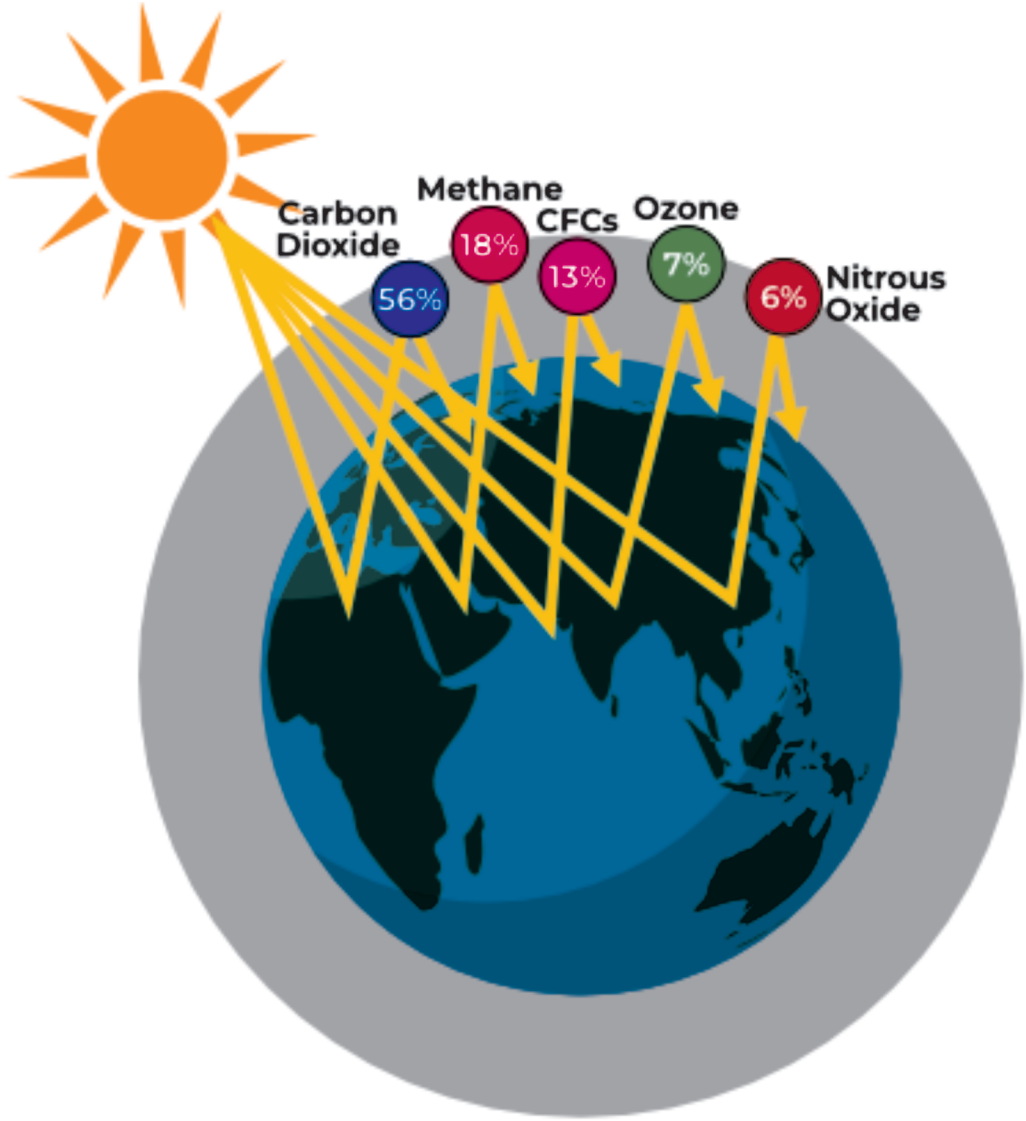


Source: https://www.geeksforgeeks.org/what-is-the-greenhouse-effect/

# ৪ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্যাসসমূহ

আমরা আগেই জেনেছি, মূলত মানুষের সৃষ্ট বিবিধ কাজের ফলাফল হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা এটাও জেনেছি যে, বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অতিমাত্রায় অনুপ্রবেশের কারণে সূর্যের তাপ পৃথিবীতে এসে আর সহজে ফেরত যেতে পারে না, এবং ফলাফল স্বরূপ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। **'পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে যে গ্যাসগুলিকে দায়ী করা হয় সেগুলো হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড *($CO_2$)*, মিথেন *($CH_4$)*, নাইট্রাস অক্সাইড *($N_2O$)*, পারফ্লুরোকার্বনস *(PFCs)*, হাইড্রোফ্লুরোকার্বনস *($HFC_s$)* এবং সালফার হেক্সাফ্লোরাইড *($SF_6$)* ইত্যাদি। এসব গ্যাসগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত।'** এ গ্যাসগুলোই মূলত পৃথিবীর উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে।

শিল্প-কলকারখানা, যান্ত্রিক পরিবহন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইটভাঁটা, রান্না ইত্যাদির জন্য যে জীবাশ্ম-জ্বালানি ও কাঠ ব্যবহার করা হয় তা থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামক ধোঁয়া বের হয় এবং বায়ুমণ্ডলে জমা হয়।

রাসায়নিক সার, আবর্জনা ইত্যাদি থেকে নাইট্রাস অক্সাইড নামক গ্যাস তৈরি হয়।

প্রাণী বর্জ্য, জলাভূমি, নিচু জমি থেকে পচনের মাধ্যমে, পচনশীল বর্জ্য ও তেল শোধনাগার থেকে মিথেন গ্যাস বের হয়।

মানুষের বহুবিধ ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট এসব গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তনে সব থেকে বড় ভূমিকা রাখে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এই গ্যাসটাই মানুষ সব থেকে বেশি উদ্‌গিরণ করে নিজেদের তথাকথিত উন্নয়নের কথা বলে।

২০১৯ সালে পৃথিবী থেকে ৫৯ (+-৬.৬) গিগাটন কার্বন নিঃসরণ হয়েছে, যেটা ২০১০ সালের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি এবং ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫৪ শতাংশ বেশি। এভাবে গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা ও ঘনত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯ সালে যে গ্যাস নিঃসরণ হয়েছে, তার প্রায় ৭৯ শতাংশ এসেছে জ্বালানি, কারখানা, পরিবহন এবং আবাসন থেকে, এবং বাকি প্রায় ২২ শতাংশ এসেছে কৃষি ও বনজ জমির বহুবিধ ব্যবহার থেকে।

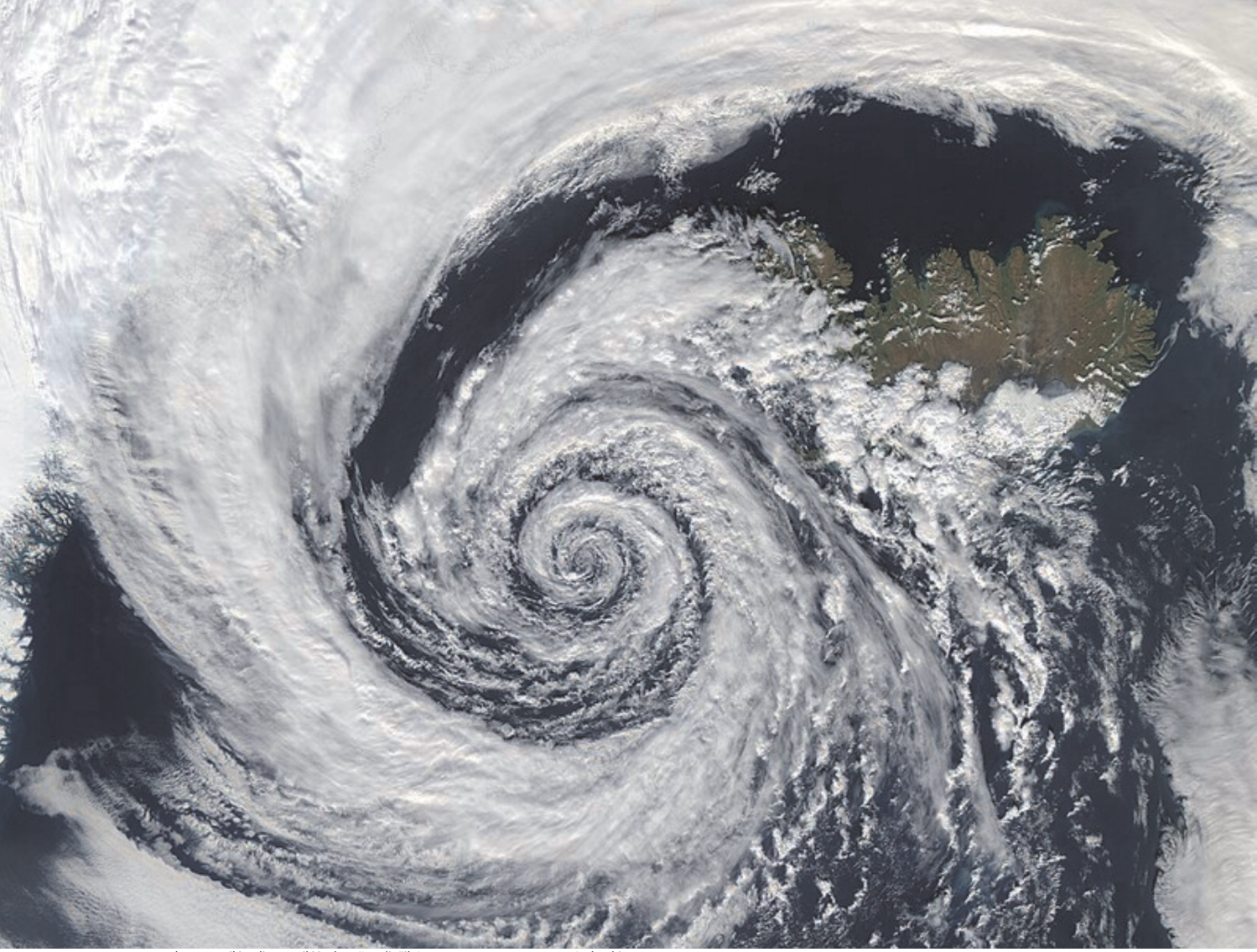

httpsen.wikipedia.orgwikiCyclone#mediaFileLow_pressure_system_over_Iceland.jpg

# ৫ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রভাবকে দুইভাগে ভাগ করা যায় -

**৫.১ অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনা** (Rapid event)

**৫.২ ধীর গতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা** (Slow onset event)

৫.১ অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনা (Rapid event): **'জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যে দুর্যোগ বা আপদের ঘটনাগুলি ঘটে থাকে, তাকে অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনা বলে।'** অল্প সময়ের মধ্যে দুর্যোগগুলো সৃষ্টি হওয়া ও ঘটে যাওয়ার কারণে এগুলো মোকাবেলায় মানুষ প্রস্তুতি নিতে খুব বেশি সময় পায় না। দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা অনেক বেশি থাকে। এমন দুর্যোগের

প্রভাব মানুষের জীবনে, সমাজে এবং প্রকৃতিতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে। সমাজ ও পরিবেশের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দুর্যোগগুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড়. অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, তাপদাহ উল্লেখযোগ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব দুর্যোগের মাত্রা, তীব্রতা ও পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Source: DRCSC, Kolkata

৫.১.১ ঘূর্ণিঝড় (Cyclone): **'সমুদ্রের কোনো এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সেখান থেকে পানি জলীয় বাষ্প হয়ে উঠে যায় এবং সেখানে একটা শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। এ শূন্যস্থান পূরণে পার্শ্ববর্তী এলাকার পানি এসে সেখানে জমা হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়া। নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণে সেখানে একটি ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপের ফলে যে ঘুর্ণনের সৃষ্টি হয়, তা অনেক সময় ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেয়।'** সাধারণত সমুদ্রের কোনো স্থানের তাপমাত্রা যদি ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর বেশি হয়, তাহলে সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়। আমাদের ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যেসব ঘূর্ণিঝড় হয়, তাদেরকে সাইক্লোন বলে। তীর অতিক্রমের সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ যদি ২১৯ কিলোমিটারের বেশি হয় তাহলে সেটাকে মহাসাইক্লোন বলে।

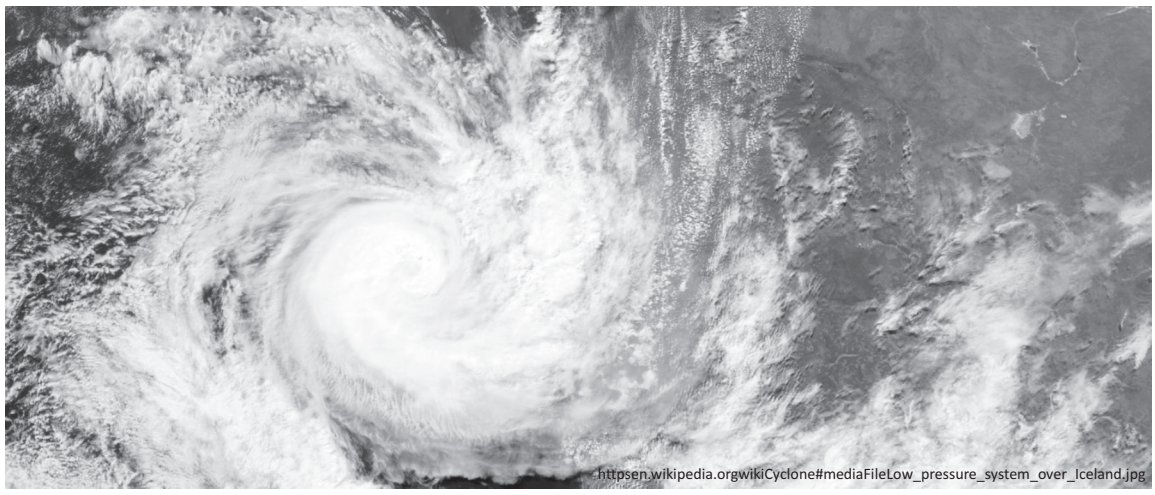

-httpsen.wikipedia.orgwikiCyclone#mediaFileLow_pressure_system_over_Iceland.jpg

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণের স্থলভাগ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এই অঞ্চলে যত ঘূর্ণিঝড় হয়, তা বাংলাদেশ, ভারত বা মায়ানমারের স্থলভাগের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে।

আমাদের এ অঞ্চলে বছরে দুই সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা থাকে। প্রথমত, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি সময়ে এবং পরবর্তীতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। তবে জলাবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব ঘূর্ণিঝড়ের সময়কালের কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ঘটে যাওয়া বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে, ১৯৭০ সালের ভোলা সাইক্লোনে প্রায় ৩ লাখ, ১৯৮৮ সালের সাইক্লোনে প্রায় ৬ হাজার, ১৯৯১ সালে ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি এবং ২০০৭ সালের সিডর সাইক্লোনে ৩ হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে আইলা, মহাসেন, সিত্রাং, মোখাসহ অনেকগুলো সাইক্লোন হয়েছে। এসব সাইক্লোনে মানুষ মারা যাওয়ার পাশাপাশি, আরো অনেক ধরনের ক্ষতি যেমন, কৃষিজমি, ফসল, ঘরবাড়ি, যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রাণীসম্পদ ইত্যাদি ব্যাপক আকারে ক্ষতির মুখে পড়ে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে থাকে এবং প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে অনেক সময় জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে ফসলি জমি দীর্ঘস্থায়ীভাবে অনাবাদী হয়ে যায়। খাদ্য ও সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয়। অধিকাংশ মানুষ গৃহহীন এবং কর্মহীন হয়ে পড়ে।

**৫.১.২ কালবৈশাখী (Nor'wester)**: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে কালবৈশাখী অন্যতম। কাল মানে ধ্বংস আর এই ঝড়টা সাধারণত বৈশাখ মাসে (মার্চ-এপ্রিল) হয়, তাই একে কালবৈশাখী বলে। **সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বাতাস**

**হালকা ও অস্থিতিশীল হয়ে আরো ওপর দিকে উঠতে থাকে এবং ওপরে উঠে কালো মেঘ গঠন করে। বাতাসের এই অস্থিরতার কারণে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয় ও বিদ্যুৎ চমকায়। এসময়ের সৃষ্ট ঝড়কে কালবৈশাখী ঝড় বলে।** কালবৈশাখী ঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ৪০-৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টি একটি সাধারণ ঘটনা। ঝড়ের স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ না হলেও, এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এসময় মাঠের ফসলের ও ফলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক বসতবাড়ি ভেঙে যায়, অনেকের ঘরের চাল উড়ে যায়, অনেকের ঘরের চাল বিশেষ করে টিনের চাল শিলাবৃষ্টির কারণে ফুটো হয়ে যায়। প্রতি বছর আমাদের এই সময় দেশে বজ্রপাতে অনেক মানুষ মারা যায়। অনেক সময় বজ্রপাতের ফলে গাছে আগুন লেগে যায়।

**৫.১.৩ অতিবৃষ্টি ও বন্যা (Flood):** বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণা করা হয় ২০৩০ সালের দিকে এসে ৫ থেকে ৬ শতাংশ বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। অনেক ফসলের খেত তলিয়ে যায়। পাহাড়ি এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে একসাথে অনেক বেশি পানি প্রবাহিত হওয়ায় পানি নিষ্কাশনের পথের এলাকাসমূহে ব্যাপক আকারে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা যায়।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এ-দেশের ওপর দিয়ে অসংখ্য নদী বয়ে গেছে। এদেশের অধিকাংশ নদীর উৎপত্তিস্থল পাহাড় ও হিমালয় অঞ্চল। এসব নদী দেশের অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে। দেশের ৮০ শতাংশ এলাকা বন্যা-প্রবণ হিসেবে পরিচিত। হিমালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে যেসব নদী প্রবাহিত হয়েছে, তা প্রবাহের সময় প্রচুর পলি নিয়ে আসে আর এসব প্রবাহিত পলি জমে আমাদের এই বদ্বীপ এলাকা গড়ে উঠেছে। যে কারণে একদিকে এসব মাটি যেমন উর্বর, আবার মাটির গঠন পরিণত না হওয়ার কারণে ভূমিক্ষয়ও হয়ে থাকে। অতিরিক্ত পানি প্রবাহের

ফলে নদী তীরবর্তী এলাকা ব্যাপক আকারে প্লাবিত হয়। আমাদের দেশে পাঁচ ধরনের বন্যা হয়ে থাকে।

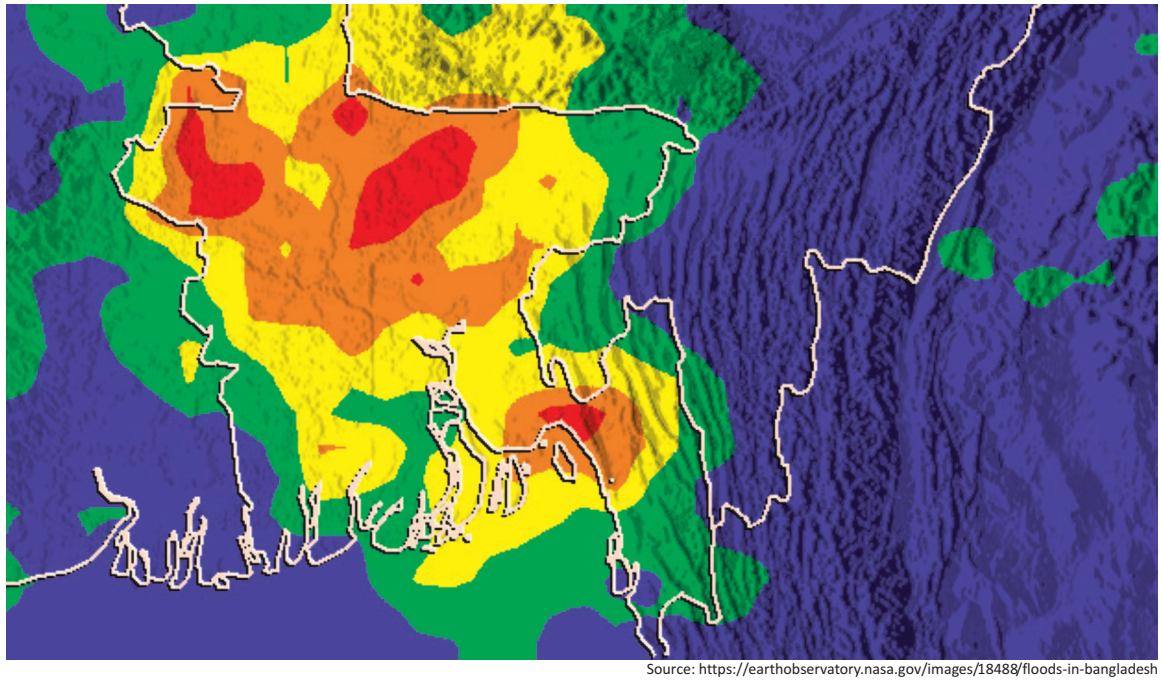

Source: https://earthobservatory.nasa.gov/images/18488/floods-in-bangladesh

**১. আকস্মিক বন্যা:** আকস্মিক বন্যা হয়ে থাকে মূলত মধ্য এপ্রিল থেকে জুনের প্রথম দিকে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাতাসের প্রবাহের যে ধরন তার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে এবং পরিবর্তনের কারণে বন্যার সময়কালের কিছুটা এদিক-ওদিক হচ্ছে বা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আকস্মিক বন্যার কারণে বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব হাওয়া ও পাহাড়ি এলাকা ব্যাপক আকারে প্লাবিত হয়। মূলত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের কারণে মেঘনা নদী ও সংযুক্ত এলাকায় এই প্লাবন হয়।

২০২২ সালের মে মাসে এরকম বন্যার ফলে সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও শেরপুর এলাকার ৭২ লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়। বন্যায় অন্যান্য ক্ষতির সাথে সাথে ৮৩,৩৯৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

**২. মৌসুমি বন্যা:** আমাদের দেশে জুন থেকে অক্টোবর সময়কাল পর্যন্ত বর্ষাকাল হিসেবে পরিচিত। সাধারণত বর্ষাকালে মৌসুমি বন্যা দেখা যায়। বাংলাদেশে সারাবছরে যত বৃষ্টিপাত হয়, তার ৮০ শতাংশ বৃষ্টিপাত সাধারণত এ-সময়ে হয়ে থাকে। প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে নদী দ্রুত পানি অপসারণ করতে পারে না। মৌসুমি বন্যার কারণে দেশের কমপক্ষে তিনভাগের দুইভাগ এলাকা প্লাবিত হয়। অনেক সময় প্লাবিত এলাকার পানি অপসারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

**৩. নদী ভাঙনের ফলে সৃষ্ট বন্যা:** দেশের খরস্রোতা নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা উল্লেখযোগ্য। এসব নদীর অসংখ্য শাখানদী ও উপনদী রয়েছে। পাহাড়ি ঢল, হিমবাহের দ্রুত গলন, অতিবৃষ্টির ফলে নদীতে তীব্র স্রোত তৈরি হয়। অতিরিক্ত পানি প্রবাহ ও পানির তীব্র স্রোতের কারণে নদীর পাড় ভাঙে এবং উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। নদী ভাঙনের ফলে বসতভিটা, কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অনেক সময় নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণেও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। মানুষ তাদের কৃষিজমি ও বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

**৪. জলাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট বন্যা:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, অসময়ে বৃষ্টি, আবার স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙন, অতি জোয়ার প্রভৃতি কারণে দেশের অনেক এলাকা প্লাবিত হয়। পানির প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে, এসব পানি আর চলে যেতে পারে না, সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় জমি আর চাষাবাদের উপযোগী থাকে না। মাঠ ফসল নষ্ট হয়ে যায়। গাছপালার শিকড়ে পচন ধরে মারা যায়।

**৫. অতি জোয়ারজনিত বন্যা:** নিম্নচাপজনিত বৃষ্টিপাত ও ভরা কোটালের সময় সমুদ্র অশান্ত থাকে। এসময়, বিশেষ করে জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে প্রচুর পানি নদীতে চলে আসে। নদী অতিরিক্ত পানি ধারণ করতে পারে না। ফলাফল স্বরূপ পানি উপকূলীয় এলাকায় ছাপিয়ে পড়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড় - পরবর্তী সময়েও অতিরিক্ত জোয়ারের পানি উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত করে। সমুদ্রের এই

লোনা পানি ফসল, গাছপালা ও মিঠাপানির মাছের অনেক ক্ষতি করে। সাধারণত বৈশাখ-আশ্বিন (এপ্রিল-অক্টোবর) মাসে এ ধরনের বন্যা হয়।

আমাদের দেশে অনেক সময় একাধিক ধরনের বন্যা একই সাথে হয়। এক ধরনের বন্যার কারণে অন্য ধরনের বন্যাও হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বড় বন্যার মধ্যে, ১৯৮৭ সালে দেশের ৪০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল, ১৯৮৮ সালে ৬০ শতাংশ এলাকা, ১৯৯৮ সালে ৭৬ শতাংশ এলাকা এবং ২০০৪ সালে দেশের তিনভাগের দুইভাগ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো সময় এদেশে একাধিক বন্যা দেখা যায়। বন্যায় কৃষিজমি, ফসল, প্রাণীসম্পদ, অবকাঠামো, আবাসন, যোগাযোগ ও কর্মসংস্থান সহ সকল সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা আক্রান্ত এলাকার মানুষের জীবন স্থবির হয়ে পড়ে।

**৫.১.৪ খরা (Drought): কোনো এলাকায় দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাত না হওয়া, এল নিনোর প্রভাব ও ভূমিক্ষয়ের কারণে পানির অভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে খরা বলে।** অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, ভূ-গর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ ব্যবহার খরাকে প্রভাবিত করে। এসময় সাধারণত পুকুর, খালবিল, নদীর পানি শুকিয়ে যায়। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এতটাই নীচে নেমে যায় যে, খাওয়ার এবং চাষের পানির প্রচণ্ড সংকট তৈরি হয়। খরা মূলত গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বাতাসের তাপমাত্রা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ কমবেশি হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। খরার কারণে ফসল ফলানো যায় না। পানির অভাবে মানুষের জীবনে পানি ও খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। বাস্তু-সংস্থানের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল খরা প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এসব অঞ্চল প্রতি আড়াই বছরে অন্তত একবার বড় ধরনের খরায় আক্রান্ত হয়। খরা-প্রবণ এলাকার ৭৭ শতাংশ জমি মাঝারি থেকে চরম মাত্রায় খরার ঝুঁকিতে রয়েছে। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণে আমন ধান ব্যতীত বছরের অন্য সময় জমি পতিত হিসেবে পড়ে থাকে। খরার কারণে অনেক সময় ডায়রিয়া, হাম, ফোস্কা পড়া সহ নানা ধরনের রোগ দেখা যায়। যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়বেটিস রয়েছে, তাদের মধ্যে হিট স্ট্রোক বা জ্ঞান হারানোর ঝুঁকি থাকে। এসময় গাছ, হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পশুপাখির মধ্যে ব্যাপক মড়ক দেখা যায় ও নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটে।

আমাদের দেশে কেবল উত্তরাঞ্চলকে একসময় খরাপ্রবণ এলাকা বলা হত। তবে অনাবৃষ্টি, অনিয়মিত বৃষ্টি ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দেশের অধিকাংশ অঞ্চল এখন খরার ঝুঁকিতে রয়েছে।

আরো অনেক ধরনের দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটে থাকে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — তাপদাহ। তাপদাহের ফলে মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারে না। অনেক সময় দাবানলের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে অনেক সময় বন উজাড় হয়ে যায় ও অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যু হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ভেতর হিটস্ট্রোক দেখা যায় ও ক্ষুধামন্দা তৈরি হয়। মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

**৫.২ ধীর গতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা (Slow Onset Event)**: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট অনেক আপদ ও দুর্যোগ ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। ধীর গতিতে ঘটে যায় বলে এ ঘটনাগুলো সহজে চোখে পড়ে না। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ধীর গতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর প্রভাব ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়। এসব আপদ ও দুর্যোগের কারণে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, গাছপালা এবং পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধীর গতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মরুকরণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া, জীব-বৈচিত্রের বিলুপ্তি, ভূমি ও বনের ক্ষয়, হিমবাহের গলন, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের অম্লকরণ ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য।

**৫.২.১ তাপমাত্রা বৃদ্ধি (Temperature Increasing)**: পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ভৌগোলিক অবস্থানভেদে এক এক জায়গায় এক এক রকম। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে এর প্রভাবও এলাকাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। গত ৫০ বছরে আবহাওয়ার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ইতিমধ্যে দেশের গড় তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-অবস্থা চলতে থাকলে ২১০০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা ২.৪ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানির বাষ্পীভবনও বেড়ে যায়। বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ তাপমাত্রার চেয়ে গরম বেশি অনুভূত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মৌসুমের পরিবর্তন হয়ে যায়। ফসলের মৌসুম হিসেবে আমাদের যে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা দিয়ে ভাল ফসল ফলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ফসলের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাচ্ছে।

**৫.২.২ মরুকরণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া ও জীব বৈচিত্রের বিলুপ্তি (Desertification, Decreasing water level, Loss of Bio-Diversity)**: তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পানি দ্রুত জলীয় বাষ্প হয়ে উড়ে চলে যায়। দ্রুত নদী, পুকুর, জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যায়। ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়া, বৃষ্টিপাত কম হওয়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা মরুকরণের জন্য দায়ী। মরুকরণ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি নীচে নেমে যাওয়ার কারণে পানির তীব্র সংকট তৈরি হয়। এ অবস্থায় জীব বৈচিত্রের টিকে থাকা কঠিন হয়ে যায়। পানির অভাবে চাষাবাদে কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।

**৫.২.৩ ভূমি ও বনের ক্ষয় (Land and Forest Degradation)**: নদী ভাঙন, মাটির ক্ষয়, অতিরিক্ত বন্যা, জলাবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। মাটির ক্ষয়ের কারণে বনভূমি বিলীন হতে থাকে। মাটি আর পানি ধরে রাখতে পারে না। মাটিতে আর ফসল হয় না। এসব জমি অনুর্বর এমনকি অনেক সময় পতিত জমি হিসেবে পরিগণিত হয়।

**৫.২.৪ হিমবাহের গলন ও সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি (Glacier retreat and Sea level rising)**: তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমালয় পর্বতমালা আর পানিকে বরফ আকারে ধরে রাখতে পারছে না। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে জমে থাকা বরফ খণ্ড গলে যাচ্ছে। হিমবাহের গলনে এগুলো পানি হয়ে সমুদ্রে

পতিত হয় এবং সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলবর্তী এলাকা নিয়মিত প্লাবিত হচ্ছে। মানুষ প্রতিনিয়ত তাদের জমি ও বাড়ি হারানোর ভয়ের মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থলভাগের ১০ শতাংশ এলাকা সমুদ্র থেকে মাত্র ১ মিটার বা তার কম উঁচুতে এবং দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা ৫ মিটার-এর কম উঁচুতে অবস্থান করছে। বর্তমানে আমাদের সমুদ্রের বাৎসরিক উচ্চতা বৃদ্ধি ৬ মিলিমিটার থেকে ২১ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ১৯০১ থেকে ২০১৮ সালের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এসময়ের মধ্যে সমুদ্রের উচ্চতা ০.২০ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলমান থাকলে ২১০০ সাল নাগাদ দেশের ১০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।

Source: https://www.climatechangenews.com20130711greenland-land-ice-melt-likely-to-drive-up-global-sea-levels

**৫.২.৫ সমুদ্রের অম্লকরণ** (Ocean Acidification): কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের ফলাফল হিসেবে সমুদ্রের অম্লতা বৃদ্ধি পায়, যা পুরো সমুদ্রের রসায়নের পরিবর্তন ঘটায়। সমুদ্র প্রায় প্রতিবছর বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ করা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এক-চতুর্থাংশ শোষণ করে। অতিরিক্ত কার্বন শোষণের কারণে সমুদ্রের পানি বেশি অ্যাসিডিক হয়ে ওঠে। সামুদ্রিক প্রাণী ব্যাপক আকারে হুমকির সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে যেসব প্রাণী শক্ত খোলস তৈরি করে, যেমন কচ্ছপ, কাঁকড়াসহ প্রবালের খোলস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমুদ্রের জীব-বৈচিত্র ও সমুদ্র -কেন্দ্রিক পর্যটন হুমকির মুখে পড়ে।

**৫.২.৬ লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ** (Saline Water Intrusion): সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া, জোয়ারে অতিরিক্ত পানি, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার কারণে উপকূলবর্তী এলাকায় সমুদ্রের পানির অনুপ্রবেশ ঘটে। শুকনো মৌসুমে লবণাক্ত পানি উপকূল থেকে নদী দিয়ে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অতিক্রম করে। সমুদ্রের পানিতে অতিরিক্ত লবণ মিশ্রিত থাকে এবং এই লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে উপকূলবর্তী এলাকার মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যায়। লবণাক্ত মাটি আর সহজে ফসল ফলাতে পারে না। কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং সুপেয় পানির ব্যাপক সংকট দেখা দেয়।

১৯৭৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উপকূলের ২৬ শতাংশ এলাকার মাটিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং এই অনুপ্রবেশের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলছে।

Source: DRCSC, Kolkata

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো একটার সাথে অপরটা জড়িত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জমে থাকা হিমবাহের গলন বৃদ্ধি পায়। হিমবাহের গলনের ফলে সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের আচরণেও পরিবর্তন হয়। উপকূলবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটে। ঠিক এরকমভাবে অন্য প্রভাবগুলোও একটার সাথে অপরটা জড়িত হয়ে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষি, অবকাঠামো ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে।

# ৬ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষয়ক্ষতিসমূহ

দুর্যোগ ও আপদের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। ১. ক্ষতি ২. ক্ষয়

**১. ক্ষতি** (Loss): ক্ষতি বলতে সাধারণত দুর্যোগের ফলে কোনো কিছু এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, এই ক্ষতিকে আর মেরামত, পুনরুদ্ধার বা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। যেমন জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, বসতভিটা বা অবকাঠামো পুরোপুরি ভেঙে যাওয়া, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সম্পদের অঙ্গহানি, মৃত্যু ইত্যাদি।

**২. ক্ষয়** (Damage): ক্ষয় বলতে বোঝানো হয় পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত নয়, অর্থাৎ একে সংস্কার, পুনরুদ্ধার বা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যেমন বসতভিটা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, বন্যায় ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা, গাছপালা, প্রাণী সম্পদ রোগাক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি।

এই ক্ষয় ও ক্ষতিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। যেসব সম্পদ, দ্রব্য বা সেবা বাজার-ব্যবস্থায় বাণিজ্য করা যায় বা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায়, তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে অর্থনৈতিক ক্ষতি বলা হয়। যেমন, সম্পদ হিসেবে দেখা কোনো প্রাণী মারা গেলে সেটা বাজারদরের সাথে বিবেচনা করে পরিমাপ করা যায়।

নীচে অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি পরিমাপের একটি হিসাবের ছক দেখানো হল:

**ক্ষয় (ড্যামেজ) ও ক্ষতি (লস)-র হিসেবের নিয়ম**

| হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা) | | | | মোট শস্য ক্ষেত ও বীজতলা (হেক্টর) | | | | অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ইত্যাদি) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত | | আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত | | সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত | | অংশিক ক্ষতিগ্রস্ত | | সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত | | অংশিক ক্ষতিগ্রস্ত | |
| হাঁস ও মুরগির সংখ্যা | মোট মূল্য | হাঁস ও মুরগির সংখ্যা | মোট মূল্য | মোট ফসলি জমির পরিমাণ | মূল্য | মোট ফসলি জমির পরিমাণ | মূল্য | মোট হ্যাচরি, খামারের পরিমাণ | মূল্য | মোট হ্যাচারি, খামারের পরিমাণ | মূল্য |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

এভাবে সকল ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতিকে পরিমাপ করা যায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এই ক্ষয় বা ক্ষতিকে শুধু অর্থনৈতিক বা সাধারণভাবে পরিমাপ করলে হবে না। এসবের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। বাস্তুতন্ত্রের ওপরও ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

এমন অনেক ক্ষয় বা ক্ষতি থাকে, যেটা অর্থনৈতিকভাবে পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু দেখা যায় মানুষের জীবনে এর প্রভাব ব্যাপক। যেমন, মানুষের মৃত্যু, স্বল্প সময়ের জন্য উচ্ছেদ হওয়া ইত্যাদি। অনেক ক্ষয় বা ক্ষতি যা কিছুটা অনুভব করা যায়, যেমন অসুস্থ হয়ে পড়া, জমি অনুর্বর হয়ে পড়া, কর্মহীন হয়ে পড়া ইত্যাদি। আবার কিছু ক্ষয়-ক্ষতি থাকে যেটা সাধারণত দেখা যায় না, যেমন দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্ছেদ হওয়া, জীব-বৈচিত্র ধ্বংস হওয়া, লোকায়ত জ্ঞান ও চর্চা হারিয়ে যাওয়া, সংস্কৃতির চর্চা নষ্ট হওয়া ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

### ৬.১ জলবায়ু পরিবর্তনে কে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ?

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সব মানুষ এমনকি সব দেশ সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই ক্ষতি নির্ভর করে সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং কারিগরি দক্ষতার ওপর। একটা উন্নত দেশ যত দ্রুত যে কোনো ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে, একটা অনুন্নত দেশের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। উন্নত দেশ তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা দিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় আগে থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে পারে।

বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা বন্যা প্রবণ। দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৪৫ জনের বেশি মানুষ বসবাস করে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থানের কারণে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং মানুষ মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি এবং অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এদেশে অতিদারিদ্রের হার বেশি। আর এসব বিবিধ কারণে এখানে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Source: https://www.iberdrola.com/social-commitment/climate-change-education

একটি সমাজের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে সবাই কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। একটা ঘূর্ণিঝড় হলে, যার মাটির ঘর আছে তারটাই সবার আগে ভেঙ্গে পড়ে। যার নৌকা নেই সে বন্যা আক্রান্ত হলে, সহজে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পারে না। যে দিন আনে দিন খায়, কর্মহীন হয়ে পড়লে সে আর খাবার সংস্থান করতে পারে না। অতিদরিদ্র মানুষ এবং যারা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে, তারা জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**৬.২ জলবায়ু পরিবর্তনে নারী ও শিশুদের উপর প্রভাব**: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারী ও শিশুরা সব থেকে বেশি অনিরাপদ অবস্থায় থাকে। আয় কমে যাওয়ায়, পরিবারে সবার খাদ্যের চাহিদা পূরণ করার পর, দেখা যায় নারীদের আর চাহিদামাফিক খাবার থাকে না । ফলাফল হিসেবে, পুষ্টিহীনতায় ভুগতে হয়। অভাবের কারণে, পরিবারের পুরুষ সদস্যের অন্যত্র কাজে চলে যাওয়ায় নারী সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে-শিশুদের বাল্য বিয়ে দিয়ে দেয়। পারিবারিক জীবনে ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে যায়, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারী নির্যাতনের ঘটনাও বেড়ে যায়। নারীদের পানি আনা সহ অন্যান্য কাজে অনেক বেশি সময় ব্যয় হয়।

# ৭ জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এ অবস্থায় আসলে আমাদের দুই ধরনের করণীয় রয়েছে। ১. যে কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, তা চিহ্নিত করা ও প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। যাকে প্রশমন বলা হয় এবং ২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে সে অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া। যাকে অভিযোজন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টেকসইভাবে বসবাসের জন্য অভিযোজন এবং প্রশমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**৭.১ প্রশমন (Mitigation):** প্রশমন বলতে বোঝানো হয়ে থাকে জলবায়ু পরিবর্তনের যে কারণগুলো রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করা। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হল বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ। তাই প্রথমে আমাদের কাজ, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বৈশ্বিকভাবে যে গ্যাসগুলো দায়ী সেগুলো চিহ্নিত করে তার নিঃসরণ বন্ধ করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে যে গ্যাসগুলো চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন গ্যাস, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ইত্যাদি যা গ্রিন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত। বায়ুমণ্ডলে এ গ্যাসের পরিমাণ যত বাড়বে, জলবায়ু পরিবর্তন তত দ্রুত হতে থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে হলে বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসগুলোর নিঃসরণ কমাতে হবে এবং যে গ্যাসগুলো রয়েছে তা কমিয়ে আনতে হবে। তাহলে প্রশ্ন আসে, আমরা কীভাবে এই গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে বা বন্ধ করতে পারি এবং বায়ুমণ্ডলের গ্রিন হাউস গ্যাস কমিয়ে আনতে পারি?

এ গ্যাস নিঃসরণ প্রতিরোধে রাষ্ট্র, সমাজ, পারিবারিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ ও কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এই গ্যাস নিঃসরণের জন্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবে দায়ী, কারণ তারা অনেক আগে থেকেই উন্নয়নের নামে সব থেকে বেশি গ্যাস নিঃসরণ করছে। এজন্য তাদেরকে সমাধানের জন্যও সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। একদিকে তাদের গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে এবং অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে প্রশমন ও অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন ফোরাম, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর দাবি আদায়ে জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে। নাগরিক সমাজ ও গবেষকবৃন্দ তথ্য উপাত্ত ও যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে দাবি আদায়ে সোচ্চার হতে পারে।

সামাজিক ও সাংগঠনিক পর্যায়ে জনসচেতনতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যে যে কারণে বা সেক্টর থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়, তা চিহ্নিত করে বিকল্প উপায় খুঁজে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

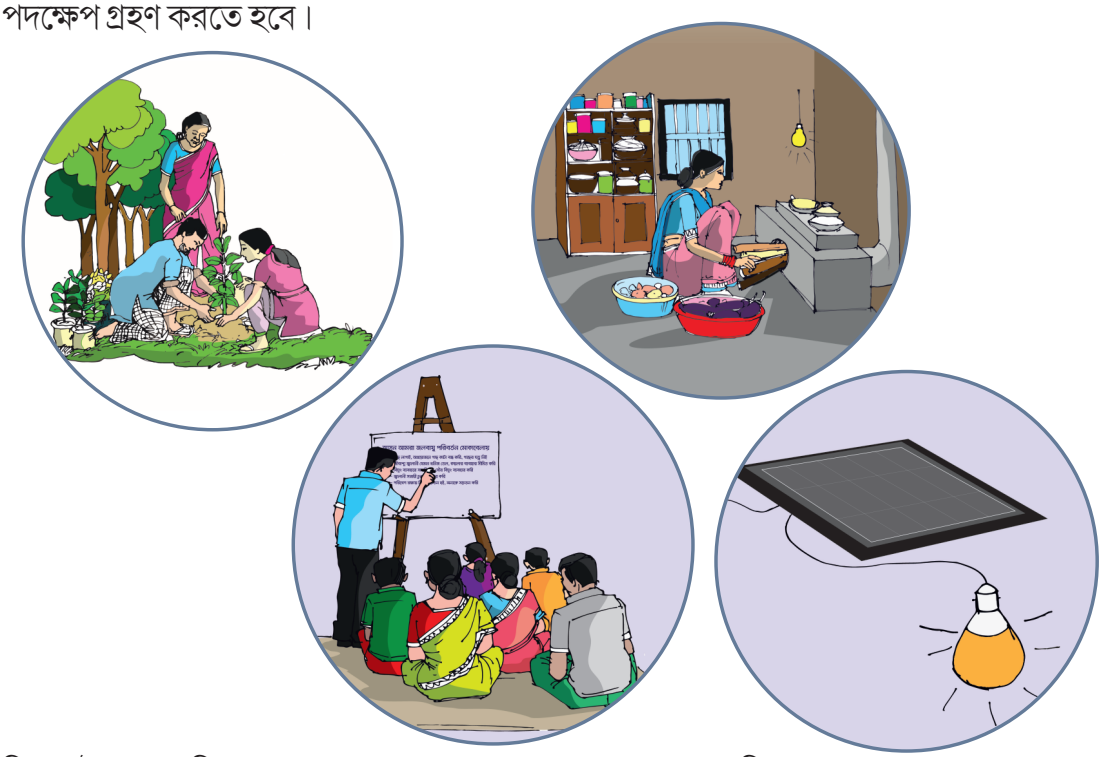

গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি:

- **নিজে সচেতন হওয়া ও অন্যকে সচেতন করা:** জনসচেতনতা তৈরি করা, জলবায়ু বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে দিবস পালন, আলোচনা, ছবি প্রদর্শনী ও পথ-নাটকের আয়োজন। স্কুলে রচনা প্রতিযোগিতা, দেয়ালিকা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

■ **গাছ লাগাই - পরিবেশ বাঁচাই:** গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নাই, তাই যেখানে যতটুকু জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে গাছ লাগাতে হবে। গাছ লাগাতে উৎসাহ দিতে হবে। সামাজিক বনায়নে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারণ গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, সংরক্ষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। তাই যত গাছ লাগানো যাবে, তত বাতাস থেকে কার্বন সরানো যাবে।

■ **গাছ কাটা বন্ধ করি :** গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় ও কার্বন সংরক্ষণ করে। গাছ কাটা বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। গাছ কাটলে একদিকে আমরা যেমন কার্বন সংরক্ষণের সব থেকে বড় উৎসকে নষ্ট করে ফেলি, অপরদিকে গাছ পুড়িয়ে আমরা বায়ুমণ্ডলে কার্বন জমা হতে সহায়তা করি।

■ **সামাজিক বনায়ন ও প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ :** সামাজিক ও প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণে উদ্যোগী হতে হবে। জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

■ **সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার:** বসতভিটায়, কর্মক্ষেত্রে এমনকি চাষাবাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস নিঃসরণ কমানো যায়। কারণ আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তা উৎপাদনে প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন হয়। সোলার প্যানেল বা সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ হবে এবং এটি সূর্যের আলো থেকে সংরক্ষিত হয় বলে গ্যাস নিঃসরণ সে-অর্থে হয় না।

■ **বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ার আরো উপায়:** বসতভিটায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব (এলইডি ল্যাম্প) ও অন্যান্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায়। বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতন হতে হবে, প্রয়োজন ছাড়া এগুলো ব্যবহার না করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে দেখতে হবে যে, ফ্যান বা বাল্ব চালু আছে কিনা এবং চালু থাকলে বন্ধ করা। সরকারি বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতন হতে হবে, অপচয় রোধে নিজ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।

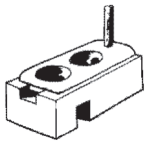

■ **বন্ধু চুলায় জ্বালনি কম, রান্না বেশি:** বসতভিটায় রান্নার জন্য উন্নত চুলা/বন্ধু চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কাঠ পোড়ানো কমিয়ে আনতে পারি।

■ **বাড়িতেই গ্যাসের কারখানা কিন্তু ক্ষতি কম :** বাংলাদেশের ৭৮ শতাংশ বাড়িতে রান্নার ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। তাহলে চিন্তা করুন, কী পরিমাণ গাছ আমরা শুধু রান্নার জন্য ব্যবহার করি! তাই বায়োগ্যাস একটা ভাল বিকল্প হতে পারে। বায়োগ্যাস স্থাপন ও ব্যবহার করে বসতবাড়ি বা স্থানীয় হোটেলে রান্নার কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

■ **বিলাসিতা কমিয়ে সুস্থ জীবন:** স্বল্প দূরত্বেও কোথাও যাতায়াতের জন্য আমরা যন্ত্রচালিত বাহনের পরিবর্তে, পায়ে চালিত বাহন যেমন সাইকেল, ভ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি। আবার বেশি দূরত্বের জন্য পাবলিক পরিবহন যেমন ট্রেন, বাস বা লঞ্চ ব্যবহার করতে পারি। খাদ্য অপচয় কমিয়ে, স্থানীয় খাবার গ্রহণের মধ্য দিয়েও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারি। প্রাত্যহিক জীবনে অতি

প্রয়োজন ছাড়া কোনো কিছু ব্যবহার না করেও, আমরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকারী ভূমিকা নিতে পারি।

■ **পানির অপচয় রোধ করা:** একই পানিকে আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি। যেমন তরকারি বা সবজি ধোয়া পানি বসতভিটায় সবজি ক্ষেতে দিতে পারি। প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করতে পারি। পানি নষ্ট না করা, পরিকল্পনা করা, জলাধার বানানো ও পানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পানির অপচয় রোধ করতে পারি।

■ **প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করা:** প্লাস্টিক তৈরিতে প্রচুর জ্বালানি লাগে, আবার এটা মারাত্মকভাবে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই এর ব্যবহার বন্ধ করি। পলিথিনের পরিবর্তে আমরা চটের বস্তা, কাপড়ের ব্যাগ, মাটির পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

■ **স্থানীয় শিল্প-কারখানা কি পরিবেশ সহায়ক? :** স্থানীয় শিল্প-কলকারখানা পরিবেশ সনদপত্র নিয়েছে কিনা তা দেখতে পারি। জলবায়ু দূষণ রোধে তাদের পদক্ষেপগুলো তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনের মাধ্যমে জানতে পারি।

■ **গবেষণার বিকল্প নাই:** নবায়নযোগ্য শক্তি কোন্ কোন্ জায়গা থেকে পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে অনেক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। যেসব সম্ভাব্য ক্ষেত্র থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পাওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হল - সূর্যের আলো ও তাপ, বাতাসের গতিবেগ, সমুদ্রের ঢেউ, নদীর পানির প্রবাহ, গ্যাস ও জ্বালানির জন্য প্রাণিজ বর্জ্য এবং শহরের ময়লা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বাংলাদেশে ভূ-তাপ ব্যবহার করেও কিন্তু শক্তি উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। তাই গবেষণায় উৎসাহিত করা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

■ **সম্মিলিত প্রতিবাদ এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ:** বন বিধ্বংসী কোন প্রকল্প হাতে নিলে, কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প হাতে নিলে, ইটভাঁটায় কাঠের ব্যবহার করলে তার প্রতিবাদে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

■ **ক্ষতিপূরণ আদায়:** জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো। তারা তাদের দেশের উন্নয়নের জন্য, বিলাসিতার জন্য উন্নয়নের নামে জলবায়ু পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। আর এই জলবায়ু পরিবর্তনে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে আমরা। তাই ক্ষতিপূরণ আদায়ে আন্তর্জাতিকভাবে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের ক্ষতিগ্রস্ততার তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের বিপদসমূহ বিশ্বকে জানাতে হবে।

■ **আন্তর্জাতিক পরিসরে জোরালো ভূমিকা রাখা:** জলবায় পরিবর্তন ও বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা মিলে বিশ্বের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীদের নিয়ে আন্তঃসরকারি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যানেল (IPCC) গঠন করেছে। আন্তঃসরকারি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যানেল-এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, মূলত মানুষের কর্মকাণ্ড জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সম্মতিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় একটি আইনি দলিল প্রণয়ন করা হয় যা

জলবায়ু বিষয়ক কনভেনশন নামে পরিচিত। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিবছর কনভেনশনভুক্ত দেশগুলো এক সমঝোতা-সভায় একসাথে মিলিত হয়। যা কপ নামে পরিচিত। যেহেতু প্রতিবছর এ সমঝোতা সভা হয় এবং এখানে প্রতিটি দেশের সরকারি-বেসরকারি মানুষ যুক্ত থাকে, তাই এখানে আমাদের তথ্যগুলো জোরালোভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। আমাদের দেশের মতো সমমনা দেশগুলোকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে আমাদের ক্ষতি ও ঝুঁকির কথা বলতে পারি এবং কার্বন নিঃসরণে অন্যান্য দেশের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা যেন বাস্তবায়ন করে তার জন্য সম্মিলিত আওয়াজ তুলতে পারি।

**৭.২ অভিযোজন** (Adaptation): অভিযোজন বলতে সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোকে বোঝায়।

অভিযোজনের জন্য তিনটে বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ -

১. **দক্ষতা উন্নয়ন** : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষকে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। দক্ষতা ছাড়া এ অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণ সম্ভব নয়। তাই বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বিকল্প আয়ের উৎস সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। তাই প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

২. **প্রযুক্তি ব্যবহার:** আমরা জানি প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার না জানলে অভিযোজন করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নিয়মিত আবহাওয়ার সংবাদ পেতে পারি। দুর্যোগের সময় নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা উন্নত চাষাবাদ করতে পারি। তবে এসব প্রযুক্তি পরিবেশ-সহায়ক কিনা সেটা জানতে হবে।

৩. **অর্থনৈতিক সক্ষমতা:** জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির মোকাবেলা করতে হলে অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকতে হবে। জলবায়ু বিপদাপন্ন মানুষের ঝুঁকি বিবেচনায় অর্থনৈতিকভাবে ভাবে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে, যেন বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে সহজে সে ফিরে আসতে পারে।

অভিযোজন হতে হবে স্থানভিত্তিক। নির্দিষ্ট এলাকার অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে অভিযোজনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি, পরিবার, এমনকি পুরো এলাকার লোকজন **'জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ'** করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। জলবায়ু-বিপদাপন্নতা পরিমাপ করার জন্য দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিপদাপন্নতা বিবেচনায় সম্ভাব্য অভিযোজনের কৌশলগুলো খুঁজে বের করা; যত রকমের অভিযোজনের কৌশল আছে বের করা। নিজেদের সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা, যেন অভিযোজন কৌশলগুলোর মধ্যে কোনো কৌশল অবলম্বনে নিজের কী সক্ষমতা রয়েছে, কী কী সুযোগ রয়েছে সেগুলো বিবেচনা করে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যেখানে অভিযোজন একা একা করা সম্ভব নয়, সেখানে যার সহযোগিতা প্রয়োজন তার সাথে যোগাযোগ রাখা এবং সেটা গ্রহণ করা। অভিযোজনের এ কৌশলসমূহ আবার বাৎসরিক পরিকল্পনায়ও যুক্ত করতে হবে। সরকারি সেবাদানকরী প্রতিষ্ঠানে অভিযোজনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং এখান থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে, অভিজ্ঞদেরও পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অভিযোজনের কৌশলগুলোতে খারাপ অভিযোজন না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খারাপ অভিযোজনের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, চাষাবাদের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত ব্যবহার। স্বল্প সময়ে এটা হয়তো লাভজনক মনে হবে, কিন্তু এর ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ক্রমান্বয়ে আরো নীচে নেমে যাবে এবং একসময় পানির সংকট আরো প্রকট হবে। জমিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশ ঘটিয়ে লবণ পানির মাছ চাষ আরেকটি উদাহরণ; স্বল্প সময়ে মাছের চাষে লাভ হলেও এখানে আর অন্য ফসল হবে না এবং ক্রমান্বয়ে অন্য এলাকায় সুপেয় পানির সংকট তৈরি হবে।

নিম্নে কিছু অভিযোজনের কৌশল দেখানো হলো।

**৭.২.১ জনসচেতনতা তৈরি**: জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যায় না, কিন্তু সচেতনতা ও পূর্ব-প্রস্তুতি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে। জনসচেতনতা তৈরির জন্য সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগ জরুরি।

**৭.২.২ অবকাঠামো উন্নয়ন**: সাধারণত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ অবকাঠামোর ক্ষতি করে। টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**৭.২.৩ জলবায়ু সহনশীল চাষাবাদ**: জলবায়ুর ঝুঁকি বিবেচনা করে চাষাবাদের পদ্ধতি নির্বাচন করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে স্থানভিত্তিক বিবেচনায় শস্য ক্যালেন্ডার করা যেতে পারে। সময় ও ঝুঁকি বিবেচনায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঠান্ডা সহিষ্ণু বীজ নির্বাচন করতে হবে। চাষাবাদে আনতে হবে নতুনত্ব। স্বল্প সময়ে উৎপাদনের শস্যসমূহকে বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে।

খরা প্রবণ এলাকায় খরা সহনশীল বীজ নির্বাচন করা জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মাটির উর্বরতা ও আর্দ্রতা দীর্ঘসময় ধরে রাখার জন্য, যেসব পদ্ধতি আছে তা

মেনে চলতে হবে। মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যেতে পারে, আবার পানির অপচয় রোধ করার জন্য সার্জন পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া স্থানীয় যে জ্ঞান রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। আবার যেসব এলাকায় লবণাক্ততা রয়েছে সেখানে লবণ সহিষ্ণু ফসল চাষাবাদ করে লাভবান হওয়া যায়। বন্যা প্রবণ এলাকায় বস্তায় সবজি চাষ, বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্য উঁচু এলাকা বেছে নেওয়া, বন্যায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে, বিকল্প ফসলের চাষাবাদ করতে হবে।

বসতভিটা ও পরিত্যক্ত জায়গায় শাক-সবজি, ফলজ ও বনজ গাছের চাষ বাড়াতে হবে। বসতভিটায় সবজি চাষের জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেমন - মাদা পদ্ধতি, বেড পদ্ধতি, বস্তায় চাষ, কালিকাপুর মডেল, বরেন্দ্র মডেল, কান্দি বা আইল পদ্ধতি, সার্জন পদ্ধতি, বেশি জলাবদ্ধ বা লবণাক্ত এলাকা হলে টাওয়ার পদ্ধতি, সমন্বিত চাষ এবং পানি ধরে রাখা বা নিষ্কাশনের জন্য নালা পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যেতে পারে। তবে বসতভিটায় চাষাবাদের জন্য পুরো বসতভিটাকে কয়েকটি ভাগে, তথা আলোকময় এলাকা, ছায়াযুক্ত এলাকা, স্যাঁতসেঁতে এলাকা এভাবে ভাগ করে, চাষের পদ্ধতি ও ফসল নির্বাচন করতে হবে।

প্রাণীসম্পদে প্রাণী পালনের জন্য স্থানীয় জাতকে বেছে নেওয়া সব থেকে ভাল। কারণ স্থানীয় জাত সাধারণত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পর্যাপ্ত আলোবাতাস সম্পন্ন আবাসস্থল, খাদ্য সংরক্ষণ ও নিয়মিত টিকাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্বল্প পরিসরে প্রাণী পালনেও স্থানীয় জাত বেছে নেওয়াই ভাল, যাতে, স্থানীয় আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

**৭.২.৪ সঞ্চয়, সুপেয় পানি ও খাদ্য সংরক্ষণ**: আপৎকালীন সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা, দুর্যোগের আগে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রাখা, বিশেষ করে শুকনো খাবার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। খাবার পানি বিশেষ করে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কৌশল রপ্ত করা, ব্যবহৃত পানি পুনরায় ব্যবহার করা, বিশেষ করে পানির অপচয় রোধ করা, লবণাক্ততা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। নিরাপদ পানির ব্যবহার ও সেচে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

**৭.২.৫ দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা**: দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগের পূর্বে কিছু কাজ রয়েছে, যেমন আপদ বা দুর্যোগ বিবেচনায় আগে থেকে কিছু খাদ্য, বিশেষ করে শুকনো খাবার ও পানি সংরক্ষণ করে রাখা প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সুনির্দিষ্টভাবে জলবায়ুজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন**: ভৌগলিক এলাকাভেদে কোন্ দুর্যোগ বেশি হয় তা খতিয়ে দেখতে হবে। দুর্যোগের ভয়াবহতা, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থান, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে না পারলে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না। তাই দুর্যোগের পূর্বের ইতিহাস জানা প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থান ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিবেচনায় দুর্যোগ পঞ্জিকা করা যেতে পারে। নতুন কোনো উদ্যোগ বা কার্যক্রম হাতে নিলে, দুর্যোগগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন কোনো বন্যা প্রবণ এলাকায় কেউ যদি নতুন ঘর তৈরি করতে চায়, তাহলে তাকে পূর্বের বন্যার ইতিহাস জেনে এবং পরবর্তী কমপক্ষে ২০ বছরের বন্যার সম্ভাবনা জেনে, সেই অনুসারে ঘর উঁচু করতে হবে ও পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। অর্থাৎ কোনো কাজ শুরুর আগে এসব পরিকল্পনাগুলো বিবেচনা করতে হবে।

- **দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি**: দুর্যোগের পূর্ব-প্রস্তুতি দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণত কোন্ দুর্যোগ কোন্ সময় হয়ে থাকে, কতদিন স্থায়ী হয়ে থাকে, সম্ভাব্য কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, তা আগে থেকে জানা জরুরি। এরপর মানুষের সক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে

হবে, অর্থাৎ অত্র এলাকার মানুষের কী সামর্থ্য আছে, স্থানীয় সম্পদের পরিমাণ কী রয়েছে এবং বাইরে থেকে কী ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে, তারও তালিকা ও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখতে হবে। দুর্যোগে পূর্ব-প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে যে দুর্যোগটা আগে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তার প্রস্তুতি নিতে হবে। দুর্যোগের পূর্ব-প্রস্তুতির ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও সেই অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

■ **দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম**: দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, দুর্যোগের ধরন অনুসারে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া। তবে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, দুর্যোগের ভয়াবহতা, ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল, দুর্যোগ আশ্রয়স্থল, ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদির ধারণ ক্ষমতা, এলাকার ভলান্টিয়ার যুবক শ্রেণি ও রেডক্রিসেন্টের সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড, নৌকা, ভ্যান গাড়ি ইত্যাদির সংখ্যা ও অবস্থান। এর মালিক সম্পর্কে তথ্য থাকলে দুর্যোগ চলাকালে নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া ও উদ্ধারকার্য সহজ হয়।

■ **দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন**: দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য দরকার, পূর্ববর্তী দুর্যোগে সাহায্য করেছেন, এলাকার এমন সব ধনী ব্যক্তি ও সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা। ধনী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কে কী পরিমাণ সাহায্য করেছে, ইউনিয়ন পরিষদ কীভাবে সাহায্য করে ইত্যাদি জানা থাকলে, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ সহজ হয়। তাছাড়া ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য এই সকল সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসকে সরবরাহ করতে পারলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে। দুর্যোগের মাত্রা বুঝে গণ মানুষের কাছ থেকে, কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং স্বীকৃত ভলান্টিয়ার দলের মাধ্যমে সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এসব কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

**৭.২.৬ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি**: সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো বিলি-বণ্টনের কিছু নিয়ম রয়েছে এবং পাওয়ার উপযোগী মানুষের কিছু মানদণ্ড রয়েছে। তাহলে ঠিক মানুষ ঠিক সহযোগিতাটি পাচ্ছে কিনা, তা নাগরিক হিসেবে সবার জানার অধিকার রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে সেই ঠিক মানুষটি যাতে সেবাটি পেতে

পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় সেবার পরিমাণ সীমিত হতে পারে এবং জলবায়ু ঝুঁকি ও দুর্যোগ বিবেচনায় সহযোগিতা নাও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে অ্যাডভোক্যাসি করতে হবে।

**৭.২.৭ সামাজিক প্রতিরোধ**: অভিযোজনের সাথে সাথে কিন্তু কিছু মানুষ বা সুবিধাভোগী তাদের ব্যক্তি-স্বার্থে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

**৭.২.৮ পলিসি তৈরি, পলিসি বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন**: সরকারি যেসব পলিসি রয়েছে, সেগুলো পড়া, পলিসি তৈরিতে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ও পলিসি বাস্তবায়নে অ্যাডভোক্যাসির জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলোর মধ্যে রয়েছে, জাতীয় পরিবেশ নীতি, National Plan of Disaster Management, Bangladesh Climate Change Strategy and Action (BCCSAP), National Adaptation Plan of Bangladesh (NAP), 2023-2050, Nationally Determined Contributions (NDC) ইত্যাদি। এসব পলিসি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি ও জনমানুষের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রশমন ও অভিযোজনে অর্থায়নে গুরুত্ব দিয়ে অর্থসংস্থানের লক্ষ্যে দুটো পথ তৈরি করেছে। ১. সরকার নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি করেছে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্ট ফান্ড এবং ২. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে এবং বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্ট ফান্ড। এসব অর্থের ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। যথাযথ এবং সময় উপযোগী প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

**৭.২.৯ আন্তর্জাতিক অ্যাডভোক্যাসি ও অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়া**: জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের ভূমিকা তেমন একটা নেই, কিন্তু আমরা সব থেকে ভুক্তভোগী, আমরাই সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই অধিকার আদায়ে আমাদের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে যথেষ্ট এবং নিয়মিত গবেষণা থাকা প্রয়োজন, যেন আমাদের কাছে হালনাগাদ তথ্য থাকে। জলবায়ু সচেতনার সাথে সাথে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে, তারা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে আমাদের তথ্য, অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরতে পারে।

# ৮ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কিছু প্রত্যয়

জলবায়ু আলোচনায় যেসব বিষয় প্রতিনিয়ত শুনতে হয় সেসব বিষয়ে কিছু ধারণা:

**আপদ** (Hazard): আপদকে দুর্যোগের পূর্ব মুহূর্ত বলা যেতে পারে। যেসব ঘটনা দুর্যোগ বয়ে আনতে পারে, তাদেরকে সাধারণত আপদ বলে। আপদ হবে এমন একটা অবস্থা যেটা দুর্যোগ নয়, কিন্তু এ অবস্থা থেকে যেকোনো সময় দুর্যোগ সৃষ্টি হতে পারে। এসময় মানুষের চলাচল সীমিত হয়ে যায়।

**দুর্যোগ** (Disaster): কোনো একটি এলাকায় এমন একটি বিপর্যয়, যেখান থেকে ওই জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি জোরালো ও সমন্বিত প্রয়াস দরকার হয়। দুর্যোগে সাধারণত অবকাঠামো, প্রকৃতি ও জীবনসহ মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রীর ব্যাপক ক্ষতি, মৃত্যু, আহত ও গৃহহীন ইত্যাদি ঘটনা সংগঠিত হয়। এটা ব্যাপক বিস্তৃত হতে পারে অথবা বিশেষ কোনো

বড়ো বা ছোট এলাকায় আঘাত হানতে ও অবস্থান করতে পারে। যেমন ১. প্রাকৃতিক- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ২. মানব সৃষ্ট - রাসায়নিক বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, ৩. জৈবিক- কোভিড-১৯, বার্ড ফ্লু ৪. প্রযুক্তিগত- পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা।

**বিপদাপন্নতা** (Vulnerability)

কোনো জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বিদ্যমান এমন অবস্থা, যা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট আপদের প্রভাবে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সাথে, জনগোষ্ঠীর খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রত্যাশিত ক্ষমতাকে ভঙ্গুর, দুর্বল, অদক্ষ ও সীমাবদ্ধ করে তোলে।

$$\text{বিপদাপন্নতা} = \frac{\text{ক্ষতির আশঙ্কা}}{\text{সক্ষমতা}}$$

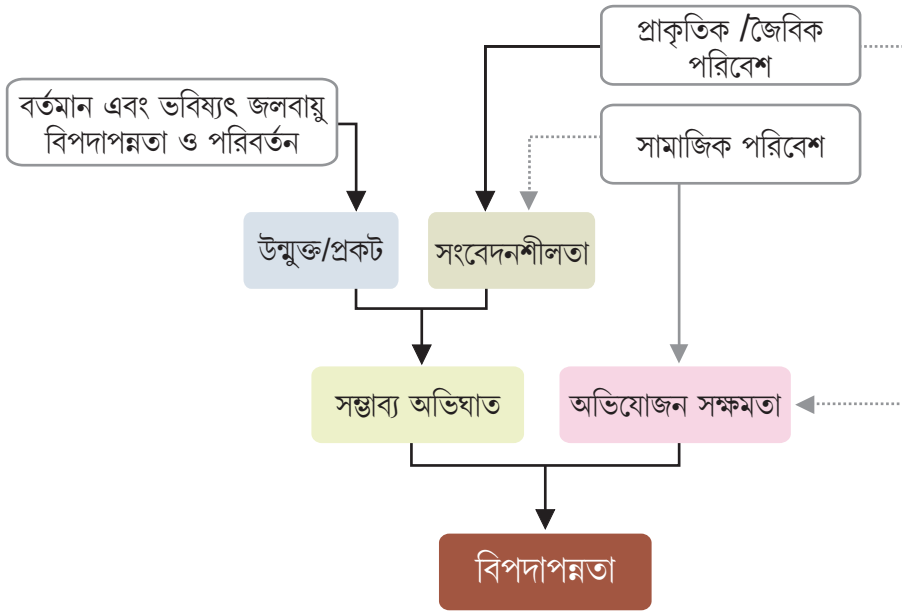


**প্রকটিত হওয়া/প্রকাশ** (Exposure): সাধারণত দুর্যোগ কোনো নির্দিষ্ট সমাজ, জনগোষ্ঠী ইত্যাদি বাছ-বিচার করে আসে না। দুর্যোগ যখন আসে তখন পুরো এলাকা জুড়ে আসে।

**সংবেদনশীলতা** (Sensitivity): দুর্যোগ একটা এলাকায় আসলেও, প্রভাব কিন্তু সবার জন্য সমান নয়। কেউ হয়তো সংবেদনশীল, আবার কেউ নয়। যেমন, যদি কোনো বন্যা হয় তাহলে একটি গ্রামে যার বাড়িঘর উঁচু জায়গায় করা আছে, তারা কিন্তু কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার কোনো দুর্যোগের সময় যেসব বাড়িতে শিশু ও বৃদ্ধ রয়েছে, তারা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অন্যদের থেকে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। আবার যারা সাইক্লোন সেন্টারের কাছাকাছি থাকে তারা দ্রুত সেন্টারে যেতে পারে।

**সম্ভাব্য প্রভাব** (Potential Impact): একটা পরিবার, সমাজ বা দেশ কতটা জলবায়ুর প্রভাবে আক্রান্ত হবে, তা নির্ভর করে সে এলাকা, জনগোষ্ঠী বা দেশ কতটা প্রকটিত অবস্থায় আছে এবং কতটা সংবেদনশীলতা তাদের মধ্যে রয়েছে তার ওপর। অর্থাৎ সম্ভাব্য প্রভাব নির্ভর করে তাদের সংবেদনশীলতা ও প্রকট অবস্থার উপর।

**অভিযোজন সক্ষমতা** (Adaptation Capacity): অভিযোজন সক্ষমতা নির্ভর করে কোনো পরিবার, জনগোষ্ঠী বা দেশের প্রাকৃতিক, অবকাঠামোগত ও সামাজিক পরিবেশ কেমন এবং কতটা সংবেদনশীল অবস্থায় রয়েছে তার ওপর।

**সক্ষমতা/সামর্থ্য/ক্ষমতা** (Capacity): সক্ষমতা হচ্ছে সত্যিকারের অথবা সম্ভাব্য কোনো দুর্যোগে উক্ত জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উপায়ে সাড়া দেওয়ার শক্তি।

**ঝুঁকি** (Risk): আপদ, বিপদাপন্নতার উপাদান এবং পরিবেশের আন্তঃক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া ও সক্ষমতার ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতিকর অবস্থা। অর্থাৎ সহজে বললে, কোনো আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির আশঙ্কা। এই দুয়ের পারস্পরিকতাই হচ্ছে ঝুঁকি।

ক. ঝুঁকি = আপদ* বিপদাপন্নতা

খ. ঝুঁকি = আপদ* $\frac{\text{বিপদাপন্নতা}}{\text{সক্ষমতা}}$

Source: https://net0.com/blog/emissions-abatement

Source: https://www.lumina.com.ph/news-and-blogs/blogs/un-policies-about-environment-and-their-impact/

# ৯ উপসংহার

পৃথিবী একটাই যেখানে আমরা বসবাস করি। আমাদের বসবাসের জন্য আর কোনো বিকল্প গ্রহ নেই। পৃথিবী ভাল থাকলে এর ওপর নির্ভরশীল আমরা প্রাণীরা ভাল থাকব। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই পৃথিবীকে ভাল রাখা, এর পরিবেশ সুন্দর রাখা আমাদের দায়িত্ব। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের এ সুন্দর পৃথিবীকে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে রেখেছে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টেনিও গুতেরেস ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে বৈশ্বিক জলবায়ুর সংকট নিয়ে আলোচনায় বলেছেন, 'মানবতা নরকের দরজা খুলে দিয়েছে'। এই জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, দল, পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমি বা আমরা যেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ না হই, আর যারা এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাদেরকেও সচেতন করতে হবে ও প্রয়োজনে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি সংস্থায় জীবাশ্ম-জ্বালানি ও তেলের ব্যবহার বন্ধ করে, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। অভিযোজনের জন্য স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগানো, বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানকে গ্রহণ এবং স্থানভিত্তিক পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আপনি, আমি, আমরা সকলে মিলে আমাদের সচেতনতা, সুন্দর পরিকল্পনা ও মঙ্গলময় কাজের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর, সবার বসবাস যোগ্য, নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি।

## References:


1. Bangladesh Climate Change strategy and action plan 2009, Ministry of Environment and Forests, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, September 2009
2. Climate diplomacy towards cop 27, Articulating CSOs position together, CPRD, October 2022
3. Climate Vulnerability and Capacity Analysis, Care Handbook, Prof Robert Chambers, May 2009
4. Climate Change and Education Bangladesh, P. K. Das, March 2010
5. Climate Change in Bangladesh, Wikipedia
6. IPCC Assessment (1st to 6th ) Report
7. National Adaptation Plan of Bangladesh, (2023-2050), Ministry of Environment and Forests, Government of the Peoples Republic of Bangladesh
8. Nationally Determined Contribution, Ministry of Environment and Forests, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 2021
9. Paris Agreement, United Nations, 2015
10. Synthesizing the state of knowledge to better understand displacement related to slow onset events, Task force on displacement, Activity 1.2, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), August 2018
11. জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্তমান অতিমারি, মানুষের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ, লৌকিক প্রকাশন, দীপেশ চক্রবর্তী
12. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়ন, প্রেক্ষাপট এবং প্রত্যাশা, সিপিআরডি
13. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়িকা, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৩
14. বাংলাদেশে খরা ও মরুময়তা, উম্মে সালমা পপি ও জাহিম মোহাম্মদ ইমরান, জাতীয় খরা সম্মেলন ২০২৩ উপলক্ষে প্রকাশিত
15. মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০২২-২০৪১, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Design, Typeset & Lexical Version DRCSC